পেঁয়াজ

মেছুয়াটুলির মেসবাড়ির বাসিন্দারা সবেমাত্র সান্ধ্যভোজন সাঙ্গ করেছে এমন সময় দপ্ করে সবগুলো বাতি নিভে গেল। এটা এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তাই এখন আর এ নিয়ে মাথা গরম করে না কেউ। সরকার বা ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডের মুণ্ডুপাত না করে নিজেদের দৈনন্দিন কার্যসূচীটাকে একটু এদিক ওদিক করে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে নিত্যকার অবধারিত এই খুচরো দুর্ভোগের সঙ্গে। এই মেসেও তাই রাতের অন্ধকার চেপে বসার আগেই খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে যায় এবং আহারাদির পর যে যার ঘরে গিয়ে কাগজ-পত্র-বই না ঘেঁটে খাবার টেবিলেই গল্পগুজব চালায় অনেকক্ষণ। এরই ফাঁকে হরেরাম নিভন্ত উনোনে এক কেটলি জল চাপিয়ে বাবুদের দিনান্তের শেষ চা পানের বন্দোবস্ত করে রাখে। ঘন্টা দুয়েক আড্ডার পর একে একে যে যার ঘরে প্রস্থান করে সবাই।

আজও বিজলী বাতির হঠাৎ-অন্তর্ধানে কোন মন্তব্য করলো না কেউ। ধীরেসুস্থে হাত মুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে ফিরে এলো একে একে। হরেরাম টেবিলের মধ্যিখানে একটা হারিকেন বসিয়ে দিয়ে এঁটো থালাগুলো তুলে নিয়ে গেল। হারিকেনের স্বল্প আলোয় টেবিলের চারধারের মানুষগুলোর ছায়া পড়েছে দেয়ালে। অতিকায় অপার্থিব সব ছায়া।

কিশোরীদা কিছুক্ষণ নীরবে সেই দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "বিজ্ঞান আমাদের উপকার যেমন করেছে ক্ষতিও করেছে অনেক। মানুষের জীবনটাই যে ক্রমশই কাঠখোট্টা হয়ে আসছে তার জন্য দায়ী ওই বিজ্ঞান।"

রাজেন বললো, "সে কি কথা কিশোরীদা ! বিজ্ঞানই তো আমাদের সিনেমা, টিভি, স্টিরিও দিয়েছে। দিয়েছে আরও কত রকমারি সাজ-সরঞ্জাম, মনোরঞ্জনের উপকরণ।"

কিশোরীদা বললেন, "হ্যাঁ, তা দিয়েছে বটে। কিন্তু মনে রেখো ম নোরঞ্জনের সারবস্তু হল মন। এ যুগের মন বড় কঠিন ঠাঁই, সব কিছু যাচিয়ে বাজিয়ে চুলচেরা হিসেব করে দেখে। তাই এযুগে ভূত নেই ডাইনি নেই যক্ষ-রক্ষ-দৈত্য-দানো নেই। ভগবানের আসনও টলমল। আগের দিনে পিদিমের আবছা আলোয় ঘরের আনাচে-কানাচে, মাঠে-ঘাটের ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে নিঃসাড়ে ঘোরা-ফেরা করতেন তাঁরা। এখন জোরালো বিজলী বাতির তোড়ে সব লোপাট হয়ে গেছে।"

বিজন বলে, "কিন্তু কিশোরীদা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি না হলে আমরা সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য জানবো কি করে? আদিম মানুষ প্রকৃতিকে চিনতো না বুঝতো না, তাই মনগড়া নানান ব্যাখ্যা মেনে নিতো নির্বিকারে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মানুষ প্রকৃতির প্রকৃত রূপ জানে, তার পক্ষে সে সব ভুয়ো মন-গড়া গল্পকথা বাতিল করাই তো স্বাভাবিক !"

মানিক আপোষের সুরে বলে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানলাম। কিন্তু তা বলে ভূত-টুত কিচ্ছু নেই এমন কথা বলা যায় না। তুমি আমি হয়তো দেখিনি কিন্তু এমন অনেকে আছে যাদের নিজের জীবনে এমন সব অপার্থিব অভিজ্ঞতা হয়েছে যাকে নিছক মন-গড়া বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

ভূপতি সুযোগটা লুফে নিয়ে বলে, "ঠিক ঠিক। কিশোরীদা আপনি কখনো ভূত দেখেননি? বলুন না একটা ভূতুড়ে গল্প, আই মীন, অভিজ্ঞতা।"

অন্যরাও যোগ দিল, "প্লীজ কিশোরীদা, বলুন।"

কিশোরীদা একটা হাত তুলে ওদের নিরস্ত করে বিজনের দিকে চেয়ে বললেন, "তোমরা ভাবো জীবনটা বুঝি পাকা ফলের মতো। মিথ্যের খোসাটা ছাড়ালেই আস্ত সত্যটি হাতে আসবে। কিন্তু তা নয়। আরও বয়স ও অভিজ্ঞতা হলে বুঝবে জীবনটা আসলে একটা পেঁয়াজ। জীবন থেকে তথাকথিত কল্পনা আর অসত্যের খোলস বাদ দিতে দিতে শেষকালে আর কিছুই বাকী থাকবে না। নাকের জল আর চোখের জলই সার হবে শুধু।"

ভূপতি বলে, "বিজনের কথা ছেড়ে দিন কিশোরীদা। 'কভুর'

(Kavoor)-এর বই পড়ে অবধি বিগড়ে গেছে ছেলেটা। আমরা সব কিছু বিশ্বাস করি। আমার মামাবাড়িতে একটা বেলগাছ আছে। মামাদের চাকর ঝন্টু স্বচক্ষে হুঁকো হাতে ব্রহ্মদত্যিকে সেই বেলগাছে বসে রোদ পোয়াতে দেখেছে কতদিন।"

বিজন বলে, "সে গল্প শোনা হয়ে গেছে আমাদের। আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না সে বিষয়ে। কিশোরীদা আপনার অভিজ্ঞতা শোনা যাক। জানেন তো বিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ। যদি কোনদিন প্রমাণ পাওয়া যায় যে ভূত আছে তবে বিজ্ঞান নিশ্চয়ই সে কথা অকপটে স্বীকার করবে।"

কিশোরীদা বললেন, "ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হয়তো পেরে উঠবো না। তবে আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা শুধু তুলে ধরছি তোমাদের সামনে। অনেক আগের ঘটনা এটা। এম.এ. পাস করে আমি কিছুদিন শিলঙে একটা কলেজে পড়িয়েছিলাম সে কথা তোমরা হয়তো জানো না। কলেজের হস্টেলে থাকতাম। আরও কয়েকটি অধ্যাপক থাকতো সেখানে। এদের মধ্যে একটা খাসিয়া ছেলের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল। ভারি হাসিখুশি দিলদরিয়া ছেলেটি। আমার মত সেও নতুন কাজে ঢুকেছে। আমি ইতিহাস পড়াই, সে গণিতের অধ্যাপক। নাম হ্যামলেট অরল্যাণ্ডো সিমলে। ওর বাবা নাকি শেক্সপীয়রের দারুণ ভক্ত ছিলেন, নিজের পছন্দসই নায়ক যুগলের নাম ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেছেন।

আমরা ঠাট্টা করে বলতাম, 'তোমার ছেলে হলে তার নাম রেখো ইউক্লিড পাইথাগোরাস সিমলে।'

সিমলের তখন একটি পাহাড়ি মেয়ের সঙ্গে ভাবসাব চলছে। আমাদের কথা শুনে মুচকি মুচকি হাসতো।

"আমার বাবা তখন কাটিহারে থাকেন। লম্বা ছুটিছাটাতেই বাড়ি যাই শুধু। শিলং থেকে কাটিহার যাওয়া দারুণ খরচ এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ----। সেবার পূজোয় বাড়ি যাবো কি যাবো না তখনও ঠিক করতে পারিনি। শিলঙে আমার এক পিসি থাকতেন। আমাদের কলেজ থেকে বেশ দূরে, লাবান অঞ্চলে। হঠাৎ একদিন পিসেমশাই এসে হাজির হলেন। তাঁর ছোট বোনের বিয়ে হচ্ছে কোলকাতায়। তাঁর এবং পিসিমার

উপস্থিতি একেবারে অপরিহার্য। সমস্যা হয়েছে ছেলে পল্টুকে নিয়ে। আসছে বছর ম্যাট্রিক দেবে। ক্লাসটিচার পিসেমশাইকে ডেকে বলেছেন যে এখন থেকে ছেলের পেছনে আদা-জল খেয়ে না লাগলে নাকি তার পাসের আশা ক্ষীণ। ওঁদের একমাত্র সন্তান পল্টু। মা-বাবা আদা-জল খেয়ে লেগেছেন তাই। পরপর ক'জন টিউটর রেখে হার মেনেছেন। এক হপ্তার মধ্যে কেটে পড়ে সবাই। এমনকি হপ্তাভোর মেহনতের মজুরি নিতেও আসেনা আর।

"এখন নিজেরাই পড়াচ্ছেন। ছেলেটার বুদ্ধি আছে, শুধু ইচ্ছের অভাব। ধরে বেঁধে বই নিয়ে বসাতে হয়। একজনকে ঠায় পাহারায় থাকতে হয় সর্বক্ষণ। শেষ পর্যন্ত এইভাবে লেগে থেকে ছেলেটাকে উৎরে দিতে পারতেন হয়তো কিন্তু এর মধ্যে আবার বোনের বিয়ে লেগে গেল অকস্মাৎ। যেতে ওঁদের হবেই এবং মেরে-কেটেও দিন দশেক তো লাগবেই। বাড়িতে পল্টু থাকবে, আর চাকর বলরাম। আমারও কলেজে তখন পূজোর ছুটি, যদি পূজোর ছুটিটা ওঁদের বাড়ি কাটাই পল্টু সম্বন্ধে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হবেন ওঁরা। না, না, পল্টুকে পড়াতে হবে না। দশ দিনের পড়াশোনার টাইম-টেবিল বেঁধে দিয়ে যাচ্ছেন ওঁরা, আমি শুধু ওখানে থাকলেই যথেষ্ট।

"ওঁরা পল্টুকে দিয়ে নানারকম শপথ-টপথ করিয়ে নিয়ে ভারাক্রান্ত মনে কোলকাতা রওনা হলেন। ক'টা দিন নির্বিঘ্নে কেটে গেল। খাই-দাই আর টেনে ঘুম দিই। পিসেমশাই পসারওলা নামী উকিল। বিরাট বাড়ি। বলরাম লোকটাও রান্নাবান্না অতিথি-সৎকারে সিদ্ধহস্ত। আরামে আছি। আমার পাশের ঘরটা পল্টুর। ওর টিউটর সংক্রান্ত ব্যাপার কিছু কিছু কানে এসেছিল। তাই ওর পড়াশোনা বিষয়ে একেবারেই নাক গলাতে যাইনা। কারণ আমার তো আর টিউটরের মত কেটে পড়ার উপায় নেই, পিসিমা-পিসেমশাই ফিরে না আসা অবধি থাকতেই হবে ঘাঁটি আগলে। কাজেই বেমক্কা কিছু ঘটবার সুযোগ দিতে চাই না।

"তবে পল্টুর বাবা-মা আঁটঘাট বেঁধে দিয়ে গেছেন যথাসম্ভব। পড়ার টেবিলের সামনে একটা চার্ট ঝুলছে - সকাল ছ'টায় হাত মুখ ধুয়ে দুধ খেয়ে পড়তে বসা, আটটায় প্রাতরাশ, সাড়ে আটটা থেকে বারোটা পড়া, বারোটা থেকে একটা মধ্যাহ্নভোজন ও বিশ্রাম, একটা থেকে চারটে

পড়া, চারটে থেকে সাড়ে চারটে আধঘন্টা ছুটি। আবার সাড়ে চারটে থেকে পড়া। ছটার সময় আবার আধঘন্টা ছুটি। এরপর সাড়ে ছ'টা থেকে ন'টা অবধি আবার টানা পড়া। তারপর খাওয়া-দাওয়া করে ঘুম।

"যাবার সময় পিসিমা নিজের গা ছুঁইয়ে পল্টুকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন যে টাইম-টেবিলের এক চুল নড়চড় হবে না একদিনও। এবং মায়ের গা ছুঁয়ে কথা দিয়ে সে কথা না রাখলে যে কি হয় তাও প্রাঞ্জল ভাষায় বিশদভাবে বলে দিয়ে গেছেন এবং শেষমেশ ড্রয়িংরুম থেকে প্রকাণ্ড দেওয়াল ঘড়িটা নামিয়ে পল্টুর ঘরে ঝুলিয়ে দিয়ে গেছেন ওটা। অতএব আমার করণীয়ের মধ্যে শুধু নিজের উপস্থিতি দ্বারা যথাযথ পরিবেশটি বজায় রাখা। যথাযথ গাম্ভীর্য সমাবেশে ধারে কাছে একজন গুরুজনের অবস্থান সম্পর্কে শ্রীমানকে অবহিত করা।

"কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠলাম। টেনে ঘুম এবং ঠেসে খাওয়া - এ দুটির মধ্যেকার এন্তার অবসরটুকু ভরাবার কিছুমাত্র উপকরণ নেই। পাছে ছেলের পড়াশোনার বিঘ্ন ঘটে সেই ভয়ে রেকর্ড প্লেয়ার, রেডিও, ট্রান্সিস্টার, গল্পের বই-টই এসব অনেক আগেই বক্সরুমে পাচার করে দিয়েছেন পিসেমশাই এবং সে ঘরে বিরাট তালা মেরে সে তালার চাবি নিজের সঙ্গে নিয়ে গেছেন কোলকাতায়। এমন কি খবরের কাগজটি পর্যন্ত আসা মাত্র গোগ্রাসে পড়ে নিয়ে তক্ষুণি বলরামের হাতে প্রত্যর্পণ করতে হয়। কারণ সে কাগজ যেন খোকাবাবুর হাতে না পড়ে সে বিষয়ে কড়া নির্দেশ দিয়ে গেছেন পিসিমা। কর্মহীন দিনগুলো যেন অসহ্য বোঝা হয়ে দাঁড়ালো।

"আমাদের হস্টেলে যে সব অধ্যাপকেরা থাকতো তারা বেশীরভাগই ছুটিতে যে যার বাড়িতে চলে গেছে। সিমলে ও আর একজন, তার নাম ক্ষেত্রি, ওখানে আছে শুধু। প্রফেসার ক্ষেত্রি আমাদের থেকে অনেক সিনিয়র, হস্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। পিসিমার বাড়ি আসার দিন আষ্টেক পরের কথা। শুক্রবার সেটা। হঠাৎ একটা বুদ্ধি এলো। পল্টু তো দেয়ালে টাঙানো টাইম টেবিল দেখে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে, তাছাড়া বলরাম রয়েছে খবরদারি করতে। ওঁরা বাড়িতে থাকতে বলে গেছেন বলেই যে আমায় অষ্টপ্রহর রাজবন্দীর মত বাড়িতে আটক থাকতে হবে তার কোন মানে নেই।

"সিমলেকে ফোন করলাম। জিজ্ঞেস করলাম আগামীকাল তার কোন প্রোগ্রাম আছে কিনা। শুনলাম তার বান্ধবী নাকি গৌহাটি গেছে, কাজেই তার হাতেও এন্তার সময় এখন। পরের দিনের প্রোগ্রাম করে ফেললাম দু'জনে। গ্যারিসনে ভাল একটা বই এসেছে 'ইর্‌মা লা দ্যুস'। দারুণ হিট্‌ নাকি। সিনেমা দেখে 'নিউ চায়না'-য় চাইনীজ ডিনার খেয়ে আড্ডা-টাড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরবো। পরদিন বলরামকে বললাম একটা বিশেষ জরুরী কাজে বাইরে বেরুতে হবে। ফিরতে রাত হবে। আমার খাবার রাখার দরকার নেই।

"দুপুরে খেয়ে-দেয়ে দিবানিদ্রা দিয়ে সবে উঠেছি। সিমলে বলেছিল সাড়ে পাঁচটায় গ্যারিসনের গেটে থাকবে। বাড়ি থেকে পাঁচটার একটু আগেই বেরিয়ে পড়বো আমি। বলরাম চা দিয়ে গেছে। চা খেয়ে গড়িমসি করছি বসে বসে। খানিক পরে উঠে পল্টুর ঘরে উঁকি মারলাম। শ্রীমান মেঝের উপর কয়েকটা তাসের পাতা বিছিয়ে উপুড় হয়ে তার সামনে বসে রয়েছে। আমার সাড়া পেয়ে একবার চোখ তুলে দেখে আবার তাসের পাতায় মনোনিবেশ করলো।

'পড়ছো না যে?'

আমার প্রশ্নের উত্তরে পল্টু তাচ্ছিলের ভঙ্গীতে ঘড়ির দিকে তর্জনী তুলে দেখালো। দেয়াল ঘড়িতে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ছ'টা। ধড়মড় করে নিজের ঘরে এসে ওয়ার্ডরোব খুলে বাইরের পোশাক বার করলাম। ঠিক তখনি টেলিফোন বেজে উঠলো।

বলরামের ডাক শোনা গেল, 'দাদাবাবু, আপনার ফোন এসেছে ----।'

"তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোনটা তুলতেই লাইনের ও-প্রান্ত থেকে সিমলের কন্ঠস্বর ভেসে এলো, 'বাসু, আমার অন্য একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট এসে পড়েছে ভাই। তাই তোমার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যেতে পারলাম না আজ। আমি আন্তরিক দুঃখিত হঠাৎ এভাবে প্রোগ্রামটা ক্যানসেল করতে হল বলে। সত্যি ভাই আমিও আগে জানতাম না। প্লীজ মাইণ্ড করো না। পরে সব কথা জানতে পারলে নিশ্চয়ই আমাকে মাফ করবে। এখন

এর বেশী কিছু বলতে পারছি না। আই অ্যাম সরি।'

সিমলে ফোন ছেড়ে দিল।

"ভারি অবাক হলাম। হঠাৎ কি যে ব্যাপার হল বুঝতে পারলাম না। কথা ছিল সিমলে গ্যারিসনে পৌঁছে দুজনের টিকিট করে রাখবে। এখন আর টিকিট পাওয়া যাবে কি না কে জানে। তাছাড়া বই শুরু হয়ে যাবে ততক্ষণে, এত দেরী করে গিয়ে লাভ নেই আর। যাওয়ার উৎসাহও হচ্ছিল না খুব একটা। বিকেলটা বাড়িতেই কাটিয়ে দিলাম। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর একটা ইতিহাসের বই খুলে পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। হঠাৎ কি মনে করে ড্রয়িংরুমে এসে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলাম।

"হস্টেলের নাম্বার ডায়াল করতেই একটু পরে ওপাশ থেকে সাড়া এলো, 'হ্যালো, ক্ষেত্রি হিয়ার ----।'

"গুড ইভনিং, আমি বাসু বলছি।"

প্রফেসার ক্ষেত্রি উত্তেজিত কন্ঠে বললেন, 'ওঃ বাসু ! সারা বিকেল ধরে তোমায় কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করেছি। তুমি শিলঙে আছ জানি অথচ তোমার ঠিকানা জানি না।'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কেন, সিমলে তো আমার টেলিফোন নাম্বার জানে !'

ক্ষেত্রি হায় হায় করে উঠলেন, 'ভারি সর্বনাশ হয়ে গেছে হে। সিমলে মেট উইথ অ্যান অ্যাকসিডেন্ট দিস আফটারনুন। স্কুটারে যাচ্ছিল, পুলিসবাজারের মোড়ে একটা মিলিটারি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ডেথ।'

আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না।

ক্ষেত্রি বলে চললেন, 'প্রিন্সিপাল ছুটিতে বাইরে গেছে, হস্টেলেও কেউ নেই। একা কতদিকে যে সামলাবো। থানা-পুলিস, ডেথ-সার্টিফিকেট যোগাড়, ডেড-বডি কালেক্ট করা ----।'

ক্ষীণ কন্ঠে বললাম, 'কখন ঘটেছে এটা?'

'অ্যাকসিডেন্ট? তা সাড়ে চারটে নাগাদ হবে। একসঙ্গে বসে চা খেলাম। চা খেয়ে স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে গেল সিমলে। হস্টেল ছাড়ার

মিনিট পনেরো কি আধ ঘন্টার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। রাস্তার লোকেরাই ধরাধরি করে ডাক্তার সোমের ক্লিনিকে নিয়ে যায়। পুলিসও এসে পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই। ডাক্তার সোমই ফোন করেন আমায়।'

"আমার সমস্ত শরীর নিস্পন্দ হয়ে এলো। মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে মানুষটা ফোনে কথা বললো আমার সঙ্গে আর এরই মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল! আহা অমন প্রাণবন্ত ছেলেটা অকালে চলে গেল ----। কিন্তু তাই বা কি করে হবে? ক্ষেত্রি বলছেন সিমলে সাড়ে চারটের সময় মারা গেছে কিন্তু আমার সঙ্গে তো সে ছ'টার সময় কথা বলেছে! অ্যাকসিডেন্টের ঘন্টা দেড়েক পর!!

"ক্ষেত্রি বলে চলেছেন, 'লাইমুখরায় সিমলের এক মাসি থাকে। খবর এসেছিল এই খানিকক্ষণ আগে। ওর বাবা-মা কাল এসে পৌঁছবে। কাল সকালে তুমি এখানে এসো। পোস্ট-মর্টেমের পর দশটা নাগাদ বডি পাওয়া যাবে। কলেজের স্টুডেন্ট যারা শিলঙে রয়েছে, যাদের পেরেছি খবর দিয়েছি। তারাও আসবে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এখানেই হবে ----।'

"নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। ঘুম এলো না। চোখের সামনে সিমলের চেহারাটা বারে বারে ভেসে উঠতে লাগলো। শেষ রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মনে হল দূর থেকে ওর কন্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, '---- হঠাৎ একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট এসে পড়েছে ---- আমি আগেও জানতাম না ---- পরে সব কথা জানতে পারলে নিশ্চয়ই আমায় মাফ করবে। এখন এর বেশী কিছু বলতে পারছি না। আই অ্যাম সরি ----।'

"ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বাললাম। ঘরে কেউ নেই। তবু যেন মনে হল ওর কন্ঠস্বরের রেশ এখনও ছড়িয়ে রয়েছে ঘরময়। হঠাৎ সমস্ত শরীর কন্টকিত হয়ে উঠলো। সিমলে তো ঠিক ওই কথাগুলোই কাল আমায় ফোনে বলেছিল - ঠিক ছ'টার সময় - যখন সে আর বেঁচে নেই। কাল ওর কথাগুলো হেঁয়ালির মত মনে হয়েছিল কিন্তু এখন আর তা মনে হচ্ছে না। সিমলে

স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে সিনেমা দেখার প্রোগ্রাম বাতিল করেনি - 'হঠাৎ একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট এসে পড়েছে ---- আমিও আগে জানতাম না ---- সব কথা জানতে পারলে নিশ্চয়ই আমায় মাফ করবে - আই অ্যাম সরি ----।'"

'হ্যাঁ সিমলে, আমি জেনেছি কি সেই নিদারুণ অ্যাপয়েন্টমেন্ট যার জন্যে তুমি আসতে পারলে না।'"

কিশোরীদার কন্ঠস্বর কেঁপে উঠলো। তারপর নীরব হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বললো না। যেন বহু বছর আগের সেই দিনটির বিষাদময় ছায়া নেমে এসেছে মেছুয়াটুলির এই মানুষগুলোকে ঘিরে। এমন সময় হঠাৎ দপ্ করে আলো জ্বলে উঠলো। ঘর, বারান্দা, উঠোন, রাস্তা - সব আলোয় আলোময়। দেয়ালের সেই অতিকায় ছায়াগুলো কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিশোরীদা একটু কাশলেন। যেন নীরবতায় ছেদ টানার অনুমতি সেটা।

ভূপতি বিজনের দিকে তাকিয়ে সদম্ভে বললো, "কেমন? শুনলে তো? এ গল্পকথা নয়, একেবারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।"

বিজন ভূপতির দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে বললো, "থামো।" তারপর চেয়ারটা টেবিলের আরও কাছে টেনে টেবিলের উপর ঘুষি পাকানো হাত রেখে বললো, "দেখুন কিশোরীদা, আপনার কথা আমি অবিশ্বাস করছি না। আপনার সততায় সন্দেহ করার মত স্পর্ধা আমার নেই। তবে সত্যেরও অনেকগুলো স্তর আছে। আপনি যে অভিজ্ঞতাটা এইমাত্র শোনালেন সেটার সম্বন্ধে কি জোর গলায় এ কথা বলা যায় যে (টেবিলে ঘুষি মেরে) ইট ইজ দ্য ট্রুথ, দ্য হোল ট্রুথ, অ্যাণ্ড নাথিং বাট দ্য ট্রুথ?"

মানিক, রাজেন ও শ্যামলাল বলে উঠলো, "হিয়ার, হিয়ার।"

কিশোরীদা চশমাজোড়া খুলে পকেট থেকে রুমাল বার করে চশমার কাচ দু'টো ভাল করে মুছলেন।

তারপর চশমা এবং রুমাল যথাক্রমে যথাস্থানে রেখে প্রশ্রয়ের কন্ঠে বললেন, "যুগটাই যে এমনি। এযুগে ক্লিওপ্যাট্রা আর হেলেন অফ

ট্রয়কেও এক্স-রে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হবে সৌন্দর্যের পরীক্ষা দিতে। পেঁয়াজের খোসার মত একটার পর একটা অসত্যের পরত খুলে বাতিল করে যাবে ক্রমাগত। কিন্তু এর পরিণতি ভেবেছো? অবশেষে হাতে থাকবে শূন্য, একেবারে লবডঙ্কা।"

বিজন হাসিমুখে বলে, "সে যা হবার হবে। সত্য যদি শূন্য হয় তবে সত্যের খাতিরে তাই মানতে হবে অগত্যা। এখন আপনার গল্পের শেষটা শোনা যাক।"

কিশোরীদা বললেন, "শোনো তবে। আরও ক'দিন পরের কথা। সিমলের ফিউনেরাল চুকে গেছে আগেই। ঐ ঘটনার পর থেকে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেছিল। ছুটির বাকী দিনগুলো যেন কাটতেই চায় না। দারুণ ডিপ্রেশনে ধরলো আমায়। মনে হল শিলং ছেড়ে না গেলে শান্তি পাবো না। একদিন খবরের কাগজে পাটনায় একটা চাকরির বিজ্ঞাপন দেখলাম। সেইদিনই চোখ-কান বুজে দরখাস্ত ঠুকে দিলাম একখানা। রেজিস্ট্রি করে পাঠাতে হবে। খামে ভরে ঠিকানা লিখে বলরামকে পাঠালাম পোস্টঅফিসে গিয়ে রেজিস্ট্রি করে আসতে।

"বাড়ির কাছেই পোস্টঅফিস। সকালে খোলা থাকে, দুপুরে লাঞ্চ ব্রেকের পর আবার দুটো থেকে পাঁচটা। চারটে নাগাদ আমাদের চা দিয়ে গেল বলরাম। আমিই তাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি পাঠালাম। এরপর ডাকবাবু পিওন-টিওনরা সবাই বাড়ি ফেরার মুডে থাকবে, সব তুলে পেতে গুছিয়ে দপ্তরে তালা মারার ফিকিরে। সেই শেষ মুহূর্তে রেজিস্ট্রি চিঠির ঝামেলা পোয়াতে না চায় যদি ! চিঠি ও পয়সা নিয়ে চলে গেল বলরাম।

"চা খেয়ে চুপচাপ বসে আছি। খানিক পরেই বলরাম ফিরে এলো।

'এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল?'

বলরাম বললো, 'হয়নি।'

পোস্টঅফিসে নাকি এখনও লাঞ্চ ব্রেক চলছে। ওদের ঘড়িতে দুটোও বাজেনি এখন। বলরাম যখন বলেছে যে চারটে বেজে গেছে ওরা নাকি হাসাহাসি করেছে ওকে নিয়ে। এমন কি ও নেশাভাঙ করে কিনা সে সন্দেহও প্রকাশ করেছে কেউ কেউ। বলরামের কথা শুনে ভারি

অবাক হলাম। দুজনে পল্টুর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম ঘড়ির সময় দেখতে। আমার নিজের হাতঘড়ি ও বাড়িতে যাওয়া মাত্রই জবাব দিয়েছে। সেটিকে সারানোর সুযোগ-সুবিধা হয়ে ওঠেনি, বিশেষ প্রয়োজনও অনুভব করিনি। পল্টুর মত আমারও নাওয়া-খাওয়া-ঘুমের রুটিন চলেছে দেয়ালে টাঙানো ঐ মস্ত ঘড়ির নির্দেশে।

"দরজার কাছে গিয়ে দু'জনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে বিস্ফারিত চোখে ঘরের মধ্যে শ্রীমান পল্টুর কার্যকলাপ দেখতে লাগলাম। দেয়ালের সঙ্গে একটা চেয়ার লাগিয়ে চেয়ারের দুই হাতলে দুই পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে পল্টু। দুই হাত তার দেয়ালঘড়িতে। এক হাতে ঘড়িটাকে ধরে অন্য হাত দিয়ে ঘড়ির কাঁটা ঘোরাচ্ছে। আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাচ্ছে ঘড়ির কাঁটা। পৌনে চারটে সাড়ে তিনটে আড়াইটে হয়ে দুটোর কাছে এসে থামলো কাঁটা। পল্টু তড়াক করে লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে নেমে পড়লো। আমি নিজের ঘরে ফিরে এলাম। বলরামের তীব্র তিরস্কার আর শ্রীমান পল্টুর কাতর অনুনয়-বিনয়, কান্না কতক্ষণ ধরে চলেছিল মনে নেই। আমি নিজের জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদায় ব্যস্ত ছিলাম। পরদিন পিসিমারা এসে গেলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে হস্টেলে ফিরে এলাম। এর মাসখানেকের মধ্যেই পাটনার চাকরিটা পেয়ে যাই এবং সেই থেকে মেছুয়াটুলিতে পত্তন।

"হ্যাঁ, আর একটা কথা। শিলং ছাড়ার আগে সিমলের বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তারই মুখে শুনলাম যে যেদিন সিমলে মারা যায় সেদিন দুপুরে টেলিফোনে বাক্‌দান ঘটে তাদের। মেয়েটি সেদিনই বিকেলবেলা শিলঙে ফিরে আসে কিন্তু জীবদ্দশায় আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি সিমলের। বেচারা ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবার মুখেই মারা পড়ে। ওর বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেছে এবং প্রেয়সী হঠাৎ ফিরে এসেছে বলেই ও আমার সঙ্গে সিনেমা যেতে পারলো না, এ কথা জানলে আমার আর সেদিনের প্রোগ্রাম বাতিল হওয়ার জন্যে ক্ষোভ থাকবে না তা সিমলে জানতো এবং ফোনে সে কথারই উল্লেখ করেছিল সে।"